চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের রবীন্দ্রছোটোগল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের রবীন্দ্রছোটোগল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

জমিদারির দায়িত্ব পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পাতিসরে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করেন, তখন থেকে শুরু হয় তাঁর গল্প লেখার প্রথম মহড়া। নদীবিধৌত পদ্মাপারে তিনি যাদেরকে দেখেছেন, তারাই হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন সেই সব দীন-দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিলিয়ে তাদেরকে ধরেছেন গল্পের কৌশলগত আঙ্গিনায়।

কালের সময়সূচী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রমানসে রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের মতো তাঁর ছোটোগল্পের ধারাতেও ঋতুর পরিবর্তনের পালা-বদল ঘটেছিল। হয়েছে রীতিরও পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে উপদেশের সঙ্গে বলেছিলেন, — ''সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগলক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়।''[১] এই উদ্ধৃতির ব্যতিক্রম তাঁর জীবনে ঘটেনি। বরং সময় পরিবর্তনের তালে তালে তিনি তাঁর লেখার কৌশলগত পরিবর্তন করেছিলেন। আর তিনি নিয়েছিলেন মানুষের মনের মধ্যে থেকে টেনে বের করা অতি-আধুনিক গল্পের শৈলীগত কৌশল।

পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত গল্পগুলির মতো একেবারে নয়, তবে ভিন্ন মতে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য গল্পগুলিতে মানব-মনের বিশেষ উপলব্ধির এক সার্থক প্রকাশ দেখা গেছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে ১৮৯১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনায় পদার্পণ করেন।

'বালক' থেকে 'হিতবাদী', 'হিতবাদী' থেকে 'সাধনা', 'সাধনা' থেকে 'ভারতী', 'ভারতী' থেকে 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)', এবং 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'সবুজ পত্র'। এমনটি নয় যে, সবুজপত্রের পর তাঁর গল্প রচনায় ছেদ পড়েছিল। তবে এই উপরের প্রত্যেকটি পর্বেই বিষয় ও ভঙ্গিতে, ভাব ও ভাষাতে, এবং স্বাদে-আঙ্গিকে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর এই নতুন কৌশল কোথাও সময়োপযোগী, আবার কোথাও যুগোপযোগীর জন্য। ব্যক্তি জীবনে বার্ধক্য তাঁকে যতই গ্রাস করেছে, ততই বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে তাঁর গল্পের কাহিনি। অর্থাৎ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্পের প্রকাশ আরো শিল্পীত ও সুনির্বাচিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 'নষ্টনীড়' থেকেই রবীন্দ্রগল্পে এক নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু গবেষণার সুবিধার্থে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 'সদর ও অন্দর' গল্প থেকে আমরা অধ্যায় বিভাজন করেছি এখানে। তিনি নদীবিধৌত পদ্মাপারের মন-মানসিকতা ছেড়ে আছড়ে পড়েছেন কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনের ওপর। সেখানে গল্পের দেহ ও মনে দেখা দিয়েছে পরিবর্তনের হাওয়া। নদীকেন্দ্রিক পল্লীজীবন থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় গোড়াপত্তন করেছেন। আর গল্প হয়ে উঠেছে শহর ও শহরতলীর মন-মানসিকতা কেন্দ্রিক। প্রথম পর্বের গল্পের মতো ততটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগ প্রাধান্য নয়। এখানে দেখা দিয়েছে মনস্তত্ত্ব এবং তাঁর জটিল সমস্যার অবতারণের ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রগল্পে বিষয় রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন এবং বাগধারার প্রয়োগ ও ব্যবহারেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। গল্পের কুশলী কৌশল গঠনে প্রবাদ বা প্রবাদাংশ বা বিশিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বের

তুলনায় অনেকটা বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে। এখানে নানান কৌশলে প্রবাদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন গল্পে কি কি ধরনের প্রবাদ, বাগধারা, ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝে নিতে গল্পে ব্যবহৃত উক্ত বিষয়গুলির নিম্নে একটি তালিকা যুক্ত করা হয়েছে।

১। অহি-নকুল সম্পর্ক (বলাই)

২। অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া (সে)

৩। ইহকাল-পরকাল (সে, রবিবার)

৪। ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ (পয়লা নম্বর)

৫। এস্‌পার কি ওস্‌পার (অপরিচিতা)

৬। কণ্ঠকে নৈব কণ্ঠকম (নামমঞ্জুর গল্প)

৭। কলুর বলদ (রবিবার)

৮। কালোহি বলবত্তরঃ (নষ্টনীড়)

৯। খিচুড়ি পাকানো (কর্মফল)

১০। গুরু মারা বিদ্যে (নষ্টনীড়)

১১। গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকানো
(অপরিচিতা, বদনাম, পাত্রপাত্রী, লিপিকার 'ঘোড়া' গল্প, কর্মফল, তপস্বিনী)

১২। গভীর জলের মাছ (সে)

১৩। ঘোর কলিকাল (কর্মফল)

১৪। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা (শেষ কথা)

১৫। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (হৈমন্তী)

১৬। চেনা বামুনের আবার পৈতা(মাল্যদান)

১৭। ছাই চাপা আগুন (স্ত্রীরপত্র)

১৮। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (রবিবার)

১৯। ডুমুরের ফুল (কর্মফল)

২০। তীরে এসে তরী ডোবা (গুপ্তধন)

২১। দক্ষযজ্ঞ (অপরিচিতা)

২২। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা (কর্মফল)

২৩। দুচোখের বিষ (কর্মফল)

২৪। ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির (হালদার গোষ্ঠী)

২৫। ধনুক ভাঙা পণ (অপরিচিতা)

২৬। নাক খত খাওয়া (ভাইফোঁটা)

২৭। নাকে কানে খত দেওয়া (প্রগতি সংহার)

২৮। নাকের জল চোখের জল (দর্পহরণ)

২৯। পরহস্তগতনং ধনম (রবিবার)

৩০। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ (রবিবার)

৩১। পেটে পেটে বুদ্ধি (মাল্যদান)

৩২। পেটে খিদে মুখে লাজ (নষ্টনীড়)

৩৩। বক ধার্মিক (উদ্ধার)

৩৪। বই পোকা (শেষকথা)

৩৫। বৈতরনী পার (সে ও রবিবার)

৩৬। বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও তেমনি (নষ্টনীড়)

৩৭। মশা মারিতে কামান দাগা (দর্পহরণ)

৩৮। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া (হৈমন্তী)

৩৯। মাটিতে পা না পড়া (বদনাম)

৪০। মিষ্টান্ন মিতরে জনা (নামমঞ্জুর গল্প, চোরাইধন, রবিবার)

৪১। মুখ চুন হওয়া (ল্যাবরেটরী)

৪২। মাকালফল (অপরিচিতা)

৪৩। শনির দৃষ্টি (রবিবার)

৪৪। শুভস্য শীঘ্রম (পাত্রপাত্রী)

৪৫। সাত রাজার ধন মানিক (লিপিকা, রাসমণির ছেলে)

৪৬। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির (কর্মফল)

৪৭। সাপের পাঁচ পা দেখা (কর্মফল)

৪৮। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর (ম্যাজিশিয়ান)

৪৯। হ-য-ব-র-ল (শেষকথা)

৫০। হাতের পাঁচ (সদর ও অন্দর)

৫১। হাল ছেড়ে দেওয়া (নষ্টনীড়)

৫২। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি (হালদার গোষ্ঠী)

৫৩। হাসলে মানিক ঝরে কাঁদলে মুক্ত পরে (লিপিকার রাজপুত্তুর)

৫৪। হালে পানি পাওয়া (লিপিকার গল্প)

৫৫। হাড় কালি হওয়া (সে)

৫৬। হাঁউ মাঁউ খাঁউ (গল্প, রাজপুত্তুর)

তালিকানুসারে প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং শব্দগুচ্ছগুলি গল্পের মধ্যে কতখানি যথার্থ ব্যবহার ও বিশ্লেষিত হয়েছে, তার অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করতে গেলে, কিংবা প্রত্যেকটি প্রবাদের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার জানতে গেলে গল্পের প্রেক্ষাপটটিকে বুঝে নিতে হবে। সে কারণেই গল্পের আলোচনার সঙ্গে সমতালেই প্রবাদগুলির প্রয়োগত যুক্তি কেমন বা কতটা ছিল তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব।

'অহি-নকুল সম্পর্ক' বাগধারাটির অর্থ চির শত্রুতার সম্পর্ক। 'বলাই' গল্পে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতিটির অর্থ এভাবে ব্যাখ্যা করেন, — 'মানুষের জীবনটা

পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে — আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছেন।"[২] অর্থাৎ গল্পকার মানুষের মধ্যে যে বৈপরিত্যমূলক বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থায় আছে, তা প্রকাশ করতেই এই বাগধারাটিকে সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া'র 'সে' গল্পগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক গল্পে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার প্রকৃতার্থ হল দূর্বল ব্যক্তি যদি চতুরও সাহসী হয়, সে প্রবল শত্রুকেও ভয় করে না। গল্পে কথক পুপুদিদির কম বুদ্ধি নিয়ে ঠাট্টা করলে, পুপে জানতে চায় এটি আসলে ঠাট্টা না প্রকৃত গাল দেওয়া? এর উত্তরে কথক বলেছেন, — "পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া'র ঘোষনা নেই।"[৩] এটি খুনসুটি করার মতো স্নেহ পরিপূর্ণ ঠাট্টা। এখানে লেখক ঠাট্টার রহস্যকে তুলে ধরার জন্য না-বাচক অর্থে প্রবাদটির প্রয়োগ করেছেন। গল্প কাঠামোর পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার।

'ইহকাল-পরকাল' বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছটির অর্থ হল বর্তমানকাল এবং মৃত্যুর পরবর্তীকাল। 'সে' গল্পের কথক পুপুদিদিকে গল্প শোনাতে এবং শ্রোতাদের মধ্যে গল্প কৌতুক মেটাতে এমন গল্প বানিয়েছে, যেটা বর্তমানকালকে অতিক্রম করে পরবর্তীকাল পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে। লেখক এখানে গল্প পিপাসু পাঠকের উদ্দেশ্যে শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ করেন। অন্যদিকে 'রবিবার' গল্পে কথক রবীন্দ্রনাথ গল্পের নায়ক অভীকের পিতার গোড়ামির পরিচয় দিতে

শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করে লেখক বলেছেন, — ''আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ছেলে। বিষয় ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁটি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আর একদিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।''[৪] লেখক এখানে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরতেই শব্দগুচ্ছটির যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ' সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ যাবজ্জীবন নাই বা বাঁচলাম, কিন্তু যে করে হোক বই পড়া অর্থাৎ জ্ঞানাহরণ করতেই হবে। 'পয়লা নম্বর' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রবাদপ্রতিম মূল সংস্কৃত উক্তিটির যেন প্যারোডি করেছেন। গল্পের কথক নিজের সম্পর্কে এই সংস্কৃত প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছেন যে ভ্রমণ পিপাসু মানুষ যেমন বেড়াতে ভালোবাসে, ঠিক বই পড়া তার এমন নেশা যে আর্থিক অভাব অনটনের দিনে ছোটো বেলায় কথক ভ্রাম্যমান মানুষের টাইমটেবিল পড়ার মতো বইয়ের ক্যাটালগ পড়তেন। কথক নিজের চরিত্রগত এই দিকটির যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তেমনি প্রবাদটির মাধ্যমে চরিত্রগত দিকটিকে আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। গল্পকার যে সংস্কৃত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন, তার মূল সংস্কৃত শ্লোকটি হল, —

'যাবজ্জীব্যে সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!'

অর্থাৎ যতদনি বাঁচব সুখেই বাঁচব, ঋণ করেও ঘি খাওয়া চাই। সুতরাং যে কোনও মূল্যে আত্মসুখী হওয়া। মূল প্রবাদের গঠনগত, ভাবগত দিকটিকে লেখক গ্রহণ করেন, এবং শব্দগত কিছু পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট প্রবাদে নবতর ব্যঞ্জনা দান করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কুশলী ভাবনায় ছন্দ

ও গঠনের দিকটিকে যথাযথ রেখে নতুন বিষয়ের প্রবেশ ঘটালেন।

'এস্‌পার কি ওস্‌পার' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি লেখক গল্পে 'এস্‌পার-ওস্‌পার' রূপে প্রয়োগ করেছেন। যার অর্থ কোনও একটা কিনারাবস্থা হওয়া। 'অপরিচিতা' গল্পে নায়কের বিবাহের দিনে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটা তুমুল গণ্ডগোল বেঁধে যায়। এমতাবস্থায় শম্ভুনাথ বাবুর এক উকিল বন্ধুর মধ্যস্থতায় তার একটা সমাধান হয়। তা না হলে লেখক কথিত ভাষায়, — ''গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওসপার হইত।''[৫] সুতরাং বিয়ে বাড়িতে বড় অঘটন ঘটার সম্ভাবনা একটা ছিল।

'কণ্ঠকে নৈব কণ্ঠকম' সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা অর্থ এভাবেই প্রকাশ করা যায় যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। 'নামমঞ্জুর গল্প' গল্পে কথকের পিসিমার আশ্রিতা অমিয়া, যে মিশনারী শিক্ষায় শিক্ষিত, অনাথ সদনের অন্যতম কর্মী। বাড়ির সমস্ত কিছুতেই তার অধিকার থাকলেও পূজার্চনার সব দায় দায়িত্ব পিসিমার আনা কয়েকজন মেয়ের উপরে। এদের মধ্যে অন্যতম হল হরিমতি। যার আচার-আচরনে অমিয়া সন্তুষ্ট নয়, এবং তার উপরে কোনও শ্রদ্ধাই নেই। দাদার ঘরে সেবিকা রূপে হরিমতিকে দেখার পর আমিয়া রাগান্বিত হয়ে ওটে। অমিয়ার আচার ব্যবহারে হরিমতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর অমিয়া দেশবিশ্বাসী, দেশভক্ত দাদার সেবার জন্য প্রসন্নকে হাজির করে। যার সঙ্গে হরিমতির মতনৈক্যের অন্ত নেই। তারা যেন একে ওপরের পরম শত্রু। অমিয়া হরিমতিকে উৎখাত করার জন্য সেবা কাজে প্রসন্নকে নিযুক্ত করে তাকে বিপদ সম্মুখীন করেছেন। একে অপরের দেখতে না পাওয়া প্রসঙ্গে লেখক উক্ত প্রবাদটি যথার্থ প্রয়োগ করেন।

'কলুর বলদ' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল 'যে সম্পূর্ণ অপরের নির্দেশে চলে।' রবিবার গল্পে শব্দগুচ্ছটি অভীক নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন, — ''আমাদের এই চোখে ঠুলি পরা ঘানি ঘোরানোর দেশে আমার

চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে।”[৬] কোনও কাজ বা বিশ্বাসকে না জেনে অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলাকে বলা হয় কলুর বলদের কাজ। কারণ বলদকে দিয়ে অনুরূপ ভাবে কাজ করানো হয়। এখানে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধার উপমায় শব্দগুচ্ছটির ব্যবহার করা হয়েছে।

‘কালোহি বলবত্তরঃ’ সংস্কৃত প্রবাদটির অর্থ হল সময় সবচেয়ে বলবান। ‘নষ্টনীড়’ গল্পে অমল চারুর কৌতুক ষড়যন্ত্রের বস্তু হল মন্দাকিনী। তারা নানা কৌশলে মন্দাকে দূরে দূরে রাখার চেষ্টা করলেও মন্দা তা সহজে বুঝতে পারে। তাই কোথাও অমল চারু একত্র হলেই সেখানে মন্দার উপস্থিতি অনিবার্য। কমলাকান্তের সমালোচনা নিয়ে অমল চারুর মধ্যে এমন পড়া চলছিল, তখন মন্দা সেখানে হাজির হওয়ায় তাকে নিয়ে পরিহাস করা উভয়ের পক্ষে বেশ কঠিন হয়, এই পরিস্থিতি বুঝতে পারায় সে ওখান থেকে সরতে রাজি নয়। যার পঠনপাঠনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ কোনও দিনেই ছিল না, হঠাৎ সে পড়া শুনতে আগ্রহ দেখায়। এখানে গল্পকার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে উক্ত প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন। এতে চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠক সমক্ষে লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

‘কলির ভগীরথ’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির মূল বাগধারাটি হল ‘কলির অবতার’। ‘নামমঞ্জুর’ গল্পে কথক জেল থেকে বের হওয়ার পর প্রকৃত মাকে না পেয়ে তিনি পেয়েছেন মা রূপ মাসিমাকে। কথক তাঁর স্নেহের-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। কথক কোনও ভাবেই তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। তাই দীর্ঘদিন পশ্চিমে ঘর-সংসার থাকা সত্ত্বেও পিসিমাকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মতো কথক তাঁকে পূর্বে অর্থাৎ কলিকাতায় নিয়ে এলেন। এখানে গল্পকার ‘কলির অবতার’ বাগধারাটির গঠনগত ও ভাগবত দিককে গ্রহণ করে নতুন রূপে শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ করে, এই ধারায় নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি।

‘খিচুড়ি পাকানো’ বাগধারাটির অর্থ সহজ বিষয়কে সহজ না করে ক্রমশ তা জটিল করা। ‘কর্মফল’ গল্পে মন্মথ একেবারে সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ।

তিনি আয় অনুসারে ব্যায় করেন, এবং সহজ পথে জীবনাচরণ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। দীর্ঘদিনের বাঙালিয়ানায় অভ্যস্ত ছেলেকে বিধুমুখী সাহেবীয়ানায় গড়ে তুলতে চায়। তাঁর বিশ্বাস বাঙালি জীবনাচরণে কোনও বানানোর যথোপযুক্ত খরচ তাঁর নেই। সেই কারণেই মন্মথ বিধুমুখীকে স্পষ্ট করে জানিয়েছে, — ''ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেব-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না।''[৭] অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছেলেকে সাহেব-নবাবি করে গড়ে তোলা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাদ প্রতিবাদ তৈরী হলে বিধুমুখীর নিজস্ব আচরণের উদ্দেশ্যে মন্মথর ভাষ্যে উক্ত বাগধারাটি লেখক যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।

'গুরু মারা বিদ্যা' প্রবাদটির অর্থ গুরুর শিক্ষায় গুরুকে পরাজিত করা। 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুবালার লেখা বিশ্ববন্ধু পত্রিকায় 'হাল বাংলা লেখার ঢঙ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আধুনিক কালের লেখক শ্রেণির আড়াম্বর পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়ে লেখক প্রবন্ধটি লিখেছেন। এদের মধ্যে অমল ও মন্মথ দত্তের নাম উল্লেখ হয়েছে। প্রবন্ধটি পড়ার পর ভূপতির মনে হয়েছিল এই লেখা গুরু মারা বিদ্যের মতো। অর্থাৎ যে আমলের কাছে চারুবালার লেখালেখির হাতে খড়ি, ভাষার প্রয়োগ নিয়ে সেই অমলকে তীব্র সমালোচনা। চারুবালা অমলের কাছে শিখে অমলকেই শেখাচ্ছে কোন ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে হবে। চারুর প্রবন্ধটি সম্মন্ধে ভূপতির মুখের প্রবাদটির প্রয়োগ নির্বাচনও যথার্থ।

'গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকানো' 'অপরাচিতা' গল্পে বিবাহের দিন কন্যার পিতার দ্বারা বরপক্ষ এবং বরের যে চরম অপমান তা বর অনুপম মেনে নিতে পারেননি। তাই সে ঐ দিনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় কূটবুদ্ধি পাকাতে থাকে। সে কন্যার পিতাকে এমন সমস্যায় জড়াতে চায় বা এমন কোনও বিপদে পড়বে, সে যেন বরপক্ষের হাতে পায়ে ধরতে বাধ্য থাকে এটাই তার একমাত্র কাম্য। এখানে লেখক অনুপমের এই ভবিষ্যতের

জন্য পাকানো চিন্তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবাদাঙ্গটির প্রয়োগ করেন। গল্পে কথক কথিত ভাবনাটি এরূপ, — '.... আমি খুব রাগিয়া ছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।'[৮] একই অর্থে গল্পকার 'তপস্বিনী' 'কর্মফল', 'লিপিকা', 'অপরিচিতা', 'পাত্র-পাত্রী' এবং 'বদনাম' গল্পে উক্ত প্রবাদটি সংক্ষিপ্তকারে ব্যবহার করেছেন।

'গভীর জলের মাছ' অর্থাৎ যা সহজে পাকড়ানো যায় না বা যিনি অতি বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে কিন্তু তা সহজে প্রকাশ করে না। 'সে' গল্পগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক গল্পে কথক পুপু দিদি নামক চরিত্রের কাছে তাঁর মাস্টারমশায়রে পড়ানোর কৌশল, তাঁর তীব্র বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত শব্দগুচ্ছটি এভাবে উল্লেখ করেন, — ''জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে যেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন সরোবরের গভীর জলের মাছ।''[৯] সুতরাং শিক্ষকমশায় অদ্ভুত হলেও শিক্ষাজগতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি বুদ্ধির জোরে বই না দেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনবরত পড়া বলতে থাকেন। কোনটা যে পড়ান তা তিনি ভুলে যান। তাঁর শিক্ষকতার ধরণ-ধারণ বোঝা সাধারণের পক্ষে খুব কঠিন। তাঁর এই খেয়ালীপনা স্বভাব বোঝাতে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন।

'ঘোর কলিকাল' প্রবাদাঙ্গটি 'কর্মফল' গল্পে গল্পকার সংক্ষিপ্তাকারে সুকুমারীর উক্তিতে বসিয়েছেন, —''বাপের হাতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলিকাল কিনা।''[১০] কলিকাল অর্থাৎ যুগের অশনিসংকেত এবং সতীশের মন মানসিকতাকে খুব খারাপ পরিণতি বোঝাতে উক্ত প্রবাদাঙ্গের ব্যবহার।

'ঘোর কলিকাল' অর্থাৎ অবক্ষয় ও অনাচারের যুগ। 'সে' গল্প গ্রন্থের 'গেছোবাবা' গল্পে উক্ত প্রবাদাঙ্গটির লেখক গোবরার উক্তিতে ব্যবহার করেছেন। উক্তিটি এরূপ — 'ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।"[১১] সুতরাং 'কলিকাল' অর্থাৎ অবক্ষয় ও অনাচারের যুগ, যে যুগে সবকিছুই সকলের দ্বারা সম্ভব। দুটি গল্পের দুটি প্রবাদাঙ্গ লেখক দুই রকম কনটেক্স-এ ব্যবহার করেছেন।

'চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা' 'শেষ কথা' গল্পে লেখক প্রবাদবাক্যটির আংশিক উল্লেখ করেছেন। চুরি বিদ্যাকে বড়ো বলার কারণ পরের বিদ্যাকে আত্মীকরণ করে একেবারে নিজের করে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে মহত্ত। গল্পে অচিরা বিশ্বের সমস্ত জিনিস ইউরোপ নিজের করে ব্যবহার করছে, তার বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য অধ্যাপক দাদুর কাছে প্রকাশ করে। এতে দাদু স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, — ''খুব সত্যি। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কি করে ভাবলে।"[১২] এর উত্তরে অচিরা জানায়, — ''নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এই রকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্‌গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন কী বল, সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের ওপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।"[১৩] এই প্রসঙ্গে নবীন মাধব অচিরাকে প্রশংসার সাথে বলেছেন, — ''চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা। বিদ্যার বল, রাষ্ট্রের বল, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর ছাপ মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।"[১৪] গল্পকার চরিত্রের কথনের মধ্যে দিয়ে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করে সমাজে যারা মূখ্য তাদের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এবং প্রবাদটির মধ্যে চুরি সম্মোন্ধীয় যে নীতি জ্ঞান তা প্রত্যক্ষভাবে লেখক ব্যক্ত করেছেন।

'চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো' শব্দগুচ্ছটির অর্থ কোনো কিছুর প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া। 'হৈমন্তী' গল্পে শিশিরের বাবা পশ্চিমের এক

পাহাড়ী জমিদারের অধিনে কাজ করতেন। ইতিমধ্যে শিশিরের শিশু অবস্থায় মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় তার দিকে নজর দেওয়ার কেউ ছিল। এমন কি তার বাবার কোনও সহৃদয় বন্ধু ছিল না, যে তৎকালীন সময়ে মেয়ের বয়স সম্পর্কে বাবাকে সচেতন করবে। কর্মব্যস্ত ব্যক্তির চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গক্রমে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেছেন। কারণ সেই যুগে মেয়েদের বয়স বেশি হলে বিয়ের সময় অনেক পরিমানে পণ দিতে হত। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে লেখক হৈমন্তীর প্রতি পিতার সচেতনতা এবং সাবধানতার বাণী প্রেরণ করেছেন।

'চেনা বামুনের আবার পৈতা' প্রবাদটি লেখক এভাবে ব্যবহার করেন, — ''আমাদের ঐ যে ধনা মালীটা, ওরও একটি বউ আছে - তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়া সুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় সে, বউ আছে বটে। আর তুমি মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝিনা — ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।''[১৫] ধনার স্বভাব চরিত্র কারোর অজানা নয়। স্বামী ধনার প্রতি স্ত্রীর দৃষ্টি বা সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য বিরহের ভান করার কোনও প্রয়োজন নেই। তেমনি যতীনকে সকলে জানে ও চেনে। তাই ধনার মতো বিরহে কাতর হওয়ায় স্বাভাবিক নয়। স্ত্রীর সাথে ঘোরতর বিচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও সে কর্ম বন্ধ রাখেনি। আজ সামান্য বিরহে ধনা গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে গাছের তলায় বসে থাকে না। কিন্তু যতীনের বসে থাকাটা লোক দেখানো মাত্র। তাই ধনার স্বভাবের সঙ্গে যতীনের স্বভাবের দোষগুণ মিলিয়ে প্রবাদটির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। এখানে গল্পের প্রেক্ষাপট বর্ণনাতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

'ছাই চাপা আগুন' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক ভাবে উপমা সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রবাদবাক্যটি উল্লেখ করেছেন। গল্পের নায়িকা যে আঁতুর

ঘরে মা হয়েছে, সেই ঘরে মৃণালিনী সন্তানহীনা। আর বাড়ির অন্দরের আবর্জনা এবং আঁতুর ঘরের অনাদর দেখে ডাক্তার প্রচণ্ড বিরক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে মৃণাল বলেছে ডাক্তার ভুল ভেবেছিল সে এই অনাদার হয়তো তাদের দুঃখ দেয়। কিন্তু গল্পে প্রবাদ ব্যাখ্যায় মৃণালের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন, — ''অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না।''[১৬] সে রকম অনাদর মৃণালের নিত্য জীবনে আত্ম মর্যাদা বোধে আঘাত করে। আর এই বেদনার আগুনই তার মনের গভীরে ধীরে ধীরে জ্বলছে, কিন্তু বাইরে তার তাপের কোনও প্রকাশ নেই। গল্পের পরিণতিতে এই ধীর গতির আগুন মৃণালকে বিদ্রোহী করেছে। ন্যায়নীতিহীন অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ উৎসারিত নারীর করুণ পরিস্থিতি পাঠকের মনে ছাড়িয়ে দিতেই প্রবাদটির প্রয়োগ।

'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' প্রবাদ বাক্যটির গল্পকার পরোক্ষভাবে গল্পে ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে অপ্রীতিকর কাজে নিযুক্ত করা, 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে 'রবিবার' গল্প বিবৃতির মধ্যে অভীক প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, — ''আচার ধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে।''[১৭] বাবা যতই ধার্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ হোক না কেন, অভীক এতটাই নাস্তিক যে সে কোনও কিছুতেই বিন্দুমাত্র সম্মান করে না। তাই অভীক অনায়াসে লোকাচারকে তুচ্ছ মনে ছাইয়ের মতো মূল্য দেয়। লোকাচারকে সে মানতে রাজি নয়। উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করে গল্পকার পাঠক মনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেন।

'ডুমুরের ফুল' বাগধারাটির অর্থ অদৃশ্য বস্তু বা যা সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। 'কর্মফল' গল্পে সতীশ মা, মাসী ও মেশোমশায়ের পরামর্শে সাহেবিয়ানা করতে গিয়ে বাবার বিষয় সম্পত্তি থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়। আর অন্যদিকে মাসি সুকুমারী দীর্ঘ দিন পর পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ায়, সতীশের একমাত্র আশা ভরসা পোষ্যপুত্র হওয়া পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ সতীশ দুই দিক থেকে বঞ্চিত। সে একেবারে নিঃস্ব। যারা তাকে সাহেব দীক্ষায় দীক্ষিত করেছে, তারা যখন সতীশকে নানা কারণে তিরস্কার করে, তখন সে দুঃখ পায়। এই কষ্টের কথা বান্ধবী নলিনীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে যখন সে বলে, — ''ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে —।''[১৮] এর উত্তরে নলিনী বলেছে — ''তাহলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা দেখতে পেতাম।''[১৯] অর্থাৎ 'ডুমুরের ফুল' শব্দগুচ্ছ ও 'সাপের পাঁচ পা' শব্দগুচ্ছের প্রত্যক্ষ অথচ প্রতীকী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে লেখক পাঠক মনে একটি বিশেষ ভাব প্রতিষ্টা করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সতীশের চার পাশের পারিপার্শ্বিকরা তার মধ্যে হৃদয় নামক বস্তুর অস্তিত্ব কোনোদিন অনুভব করেননি। তা সতীশের আছে বলে তাদের বিশ্বাস হয় না। যে কারণেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবেই বাগধারা দুটি পরপর ব্যবহারে সতীশের হৃদয়ের অস্তিত্বহীনতা কতটা তা ঠাট্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়।

'তীরে এসে তরী ডোবা' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ সাফল্যের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে সাফল্য না পাওয়ার মতো। 'গুপ্তধন' গল্পে হরিহরকে এক সন্ন্যাসী একটি ধাঁধা ভিত্তিক কবিতা দিয়ে বলে, তার বংশের কোনও একজন পুরুষ এ লেখা উদ্ধার করবে এবং প্রচুর ধনঐশ্বর্যের অধিকারী হবে। হরিহর পরলোক গমনের পর তার প্রাপ্ত ধাঁধার উত্তরাধিকারী বড়ছেলে শ্যামাপদর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। এই সংবাদ পাবার পর হরিহরের ভাই অনেক চেষ্টা করেও ধাঁধার গুপ্ত বিষয়

নিজে জানতে না পারায় অনেক দিন আগেই সে দেশান্তরি হয়। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী রূপধারণ করে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। গুপ্তধন উদ্ধারে নেমে মৃত্যুঞ্জয় জানতে পারে ঐ সন্ন্যাসী তার প্রতিদ্বন্দ্বী। গল্পে লেখক কথিত ভাব ও ভাষায়, — ''আজ অভীষ্ট সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুল তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।''[২০] সুতরাং জীবনের অনেক বিপদজনক পথে মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তধন পাওয়ার ঝুকি নিয়েছে। তাই 'তীরে এসে তরী ডোবা' প্রবাদটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের পরিস্থিতি ও মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থানটিকে ব্যক্ত করেছেন লেখক।

'দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার' বাগধারাটি 'অপরিচিতা' গল্পে লেখক 'দক্ষযজ্ঞের পালা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'দক্ষযজ্ঞ' শব্দটির পৌরাণিক ব্যাখ্যাটি সকলেরই জানা। দক্ষরাজার যজ্ঞে পতির অপমানে অপমানিতা সতী দেহ ত্যাগ করলে, শিব ও শিবান্ধ চরেরা যজ্ঞস্থলে 'তাণ্ডবলীলা ও ধ্বংসলীলা চালায়। সেই তাণ্ডবলীলার পূর্নরাবৃত্তি ঘটায় 'অপরিচিতা' গল্পের অপমানিত বরযাত্রীর দল। গল্পে পাত্রীর বাবার উপরে যখন নিজ কন্যার গহনা চুরির অভিযোগ আনেন স্বয়ং বরের মামা। তখন চরম অপমানিত কিন্তু আত্ম সম্মানের দিকে তাকিয়ে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে পাত্রীর বাবা সকল বরযাত্রীদের নিজ সাধ্যমত আপ্যায়ণ করে, সকলকে খাইয়ে তিনি ঘোষণা করেন এরকম লোভী পরিবারের হাতে মেয়ে দেবেন না। কন্যাপক্ষের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বরপক্ষ বিবাহ সভার, — ''ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।''[২১] সুতরাং গল্পকারের হাতে শব্দগুচ্ছটির এখানে প্রকৃত পক্ষে প্রতীকী প্রয়োগ হয়েছে।

'দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা' প্রবাদটি অতি পরিচিত এবং সকলের মুখে মুখে প্রচলিত। মূলত মায়েদের মুখে এই প্রবাদ প্রয়োগে শোভা পায়। 'কর্মফল' গল্পে দীর্ঘদিন সুকুমারীর কোনও পুত্র সন্তান না হওয়ায় সে বোন বিধুমুখীর একমাত্র সন্তান সতীশকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার সিদ্ধান্তে একসময় অনড় ছিল। এই কথা সতীশের পারিপার্শ্বিক সকলের অজানা ছিল না। এক্ষেত্রে তারা সতীশকে অতি আদরে সাহেবি ঢঙে মানুষ করতে থাকে। কিন্তু একসময় মাসি সুকুমারী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলে, সতীশের উপরে ক্রমশ তাদের আদর যত্ন কমতে থাকে এবং সতীশকে মাসি আর দেখতে পারে না। কারণ তাদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হতে পারত, কিন্তু এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভে সতীশ তাঁর একমাত্র সন্তান হরেনের প্রতি রাগান্বিত। মাসির এই ভাবনা থেকে সতীশের সঙ্গে মাসি সুকুমারীর বাক্‌বিতন্ডা শুরু হলে সতীশ পূর্বের কাহিনি স্মৃতিচারণ করে যখন তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে, তখন সতীশকে লক্ষ করে মাসির ভাষ্যে ঐ প্রবাদটি ব্যবহার করে বলেন, — ''ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।''[২২] সতীশকে তারা আদর দিয়ে পালন করলেও সে এখন পুত্র হরেনের চরম শত্রু। এই দুই পরিবারের গভীর সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতার প্রকাশকে তুলে ধরার জন্য লেখক সুকৌশলে প্রবাদটির সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে উভয়ের মধুর সম্পর্কের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান তৈরি করেছেন।

'দু চোখের বিষ' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ আদৌ সহ্য করতে না পারা। 'কর্মফল' গল্পে একদিকে বিধুমুখী আর অন্যদিকে ভগ্নিপতি শশধরের আদর আবদারে সতীশ একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। সে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে বিদেশী পোশাক-আশাক ব্যবহারে অতি আগ্রহী। কিন্তু বাবা মন্মথ

এর ঘোর বিরোধী। তাই সাহেবি পোশাক ও তাদের আচার-আচারণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে উক্ত শব্দগুচ্ছটি উল্লেখ করেন। তিনি ধুতি-চাদর, চাপকান-চোগা ব্যবহারে পক্ষপাতী কিন্তু ফিরিঙ্গি পোশাক তিনি সহ্য করতে পারেন না। এ যেন শুধু বাঙালি সমাজের কাছে নয়, প্রতিটি বাঙালি মানুষের কাছে চরম অপমান। এখানে রবীন্দ্রনাথ দুই জাতির নিজস্ব আচার-আচারণ ও তাদের পরস্পরের পোশাক পরিচ্ছদের যে পার্থক্য আছে, তা শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন।

'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ যুধিষ্ঠীর ন্যায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে জমিদারির স্বচ্ছতার কথা বলতে গিয়ে জমিদার মনোহরলালের উক্তিতে লেখক উদ্ধৃতাংশটি এভাবে ব্যবহার করেন, — ''চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয় রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠীরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না।''[২৩] এখানে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠীর' ধর্মের অনুগামী নয়, ধর্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে অসততা মুখ্য হয়ে উঠেছে। নীলকণ্ঠের আচার-ব্যবহারে বনোয়ারীলাল সে কথাটি আজ জেনেছে, তা বহুপূর্বে জেনেছেন মনোহরলাল। যদিও তার লাভের তুলনায় লোকসান বেশি হয়নি, বরং নীলকণ্ঠের দ্বারা তার সংসারে ক্রমশ উন্নতি হয়েছে। তাই লেখক শব্দগুচ্ছটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করে নীলকণ্ঠের চরিত্রের প্রকৃত দিকটি পাঠকসমক্ষে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এখানে শব্দগুচ্ছটির বিপরীতার্থে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

'ধনুক ভাঙা পণ' বাগধারাটির অর্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাদায় গ্রস্থ পিতা শম্ভুনাথবাবু পনেরো বছরের বিবাহযোগ্যা কন্যার উপযুক্ত পাত্রের জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করতে থাকেন। বিবাহের বাজারে কন্যার বয়স ক্রমশ বাড়তে থাকলেও তিনি লক্ষভ্রষ্ট হননি, গল্পের ভাষায়, — ''কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন

ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই — বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন, কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছি না।"[২৪] তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার জন্য লেখক যথার্থ অর্থে শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ করেছেন।

'নাকে খত দেওয়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ কষ্টের সাথে শাস্তি গ্রহণ করা। 'ভাইফোঁটা' গল্পে কথক সত্যধনের পিতৃপুরুষেরা ঐশ্বর্যশালী এবং সুনামের সঙ্গে বাঁচলেও বর্তমানে সত্যধন তা শেষ করে দিয়ে দরিদ্রের চরমসীমায় এসে পৌঁছেছে। তাঁর মনের জোর ও পরিকল্পনা দেখে বন্ধু প্রসন্ন তাকে বলেছিল, — 'দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতিশীল বা দুর্গাচরণলাল না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজার মোড় পর্যন্ত বরাবার সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"[২৫] লেখক এখানে ভবঘুরে বন্ধুর প্রতি মনবল বাড়াতে প্রসন্নের মুখে উক্ত শব্দ গুচ্ছের ব্যবহার করেন। আবার 'প্রগতি সংহার', 'লিপিকা' এবং 'সে' 'দর্পহরণ' গল্পে ঐ একই অর্থে শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। হরিমতিকে সেবাকাজ থেকে বিতাড়িত করেন। অর্থাৎ হরিমতির কাছে অমিয়া সরাসরি না পারলেও, সে প্রসন্নকে দিয়ে পরোক্ষভাবে জয়লাভ করেছে। এখানে হরিমতি ও প্রসন্নের চারিত্রিকগুণকে ধরার জন্য গল্পকার প্রবাদটির যথার্থ প্রয়োগে সার্থক হয়েছে।

'নাকের জল চোখের জল' প্রবাদ বাক্যটি অর্থ হল 'চরম দুর্গতি' কেঁদে কেটে একাকার করা।' 'দর্পহরণ' গল্পে কথক ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই ইংরাজি তার কাছে জলভাতের মতো, কিন্তু বাংলা ভাষাসাহিত্য তার কাছে তত বেশি দুর্বোধ্য। কথক বাংলায় লেখা উইল নির্ভুল ভাবে ব্যাখ্যায় অক্ষম হলে, আদালতে সহবন্ধু তাকে অপমানিত করে বলেন যে তাঁর স্ত্রী বাংলা ব্যাখ্যায় অনেক বেশি সাবলীল। গল্পে লেখক বলেন, — ''চুলায় আগুন ধরাইবার

বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেভানো দায়।"[২৬] অর্থাৎ কথকের এই অপমানের জন্য দায়ি তার বাড়ির অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী নির্ঝরিণী। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, বাংলা লেখা পড়ায় যে পারদর্শিতা সে খবর সকলেরই অজানা নয়। কিন্তু গল্পে কান্নার কথা বলা হয়নি, তবে ধোঁয়ার ঝাঁঝে শরীরের কষ্টের কথা বোঝানো হয়েছে। 'কর্মফল' গল্পে নেলি সতীশকে ভালোবাসে না, তাকে সর্বদা কষ্ট দেয়, সেই প্রসঙ্গক্রমে উক্ত প্রবাদটির ব্যবহার। আবার 'প্রগতি সংহার' গল্পে বইয়ের ধূলো ঝাড়ায় নাক চোখ দিয়ে জল বেরোনো, অর্থাৎ হাঁচি কাঁশির কষ্ট বোঝাতে প্রবাদটি রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো প্রয়োগ করেছেন।

'পরহস্তগতং ধনম' 'রবিবার' গল্পে গল্পকার বিভা ও অভীকের বিবাহ প্রসঙ্গে উক্ত সংস্কৃত প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত প্রবাদটির অর্থ 'পরের হস্তগত হওয়া ধন সম্পত্তি'। বিভার বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পরের অধীনাধীন হবে। তাই সে নিজেকে পরের হাতের সম্পত্তি মনে করে বলেছে, — "একদিন যখন লাল চেলি পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং।"[২৭] সুতরাং যে অপরের বাকদত্তার বসবর্তী হলে অভীকের কিছুই করার থাকবে না। সেই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন।

'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' অভীক ও বিভার পরস্পরের প্রতি গোপন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে ফল স্বরূপ গল্পকার 'রবিবার' গল্পে উক্ত সংস্কৃত প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। এটির ব্যবহারিক রূপটি হল, — "ঐতো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।"[২৮] সুতরাং দীর্ঘদিন চাপা থাকা আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ার মতো চাপা ছিল বিভা ও অভীকের ভালোবাসার আগুন। আর এই ঘনিয়ে থাকা ধোঁয়ার প্রকাশ্যে আনার জন্য অভীক প্ল্যান করে

সকালবেলায় এসে উপস্থিত হয় বিভার বাড়িতে। শীলার সঙ্গে অভীকের মেলামেশার খবর বিভার মনে আসা দিলেও। অভীকের প্রতি বিভার ভালোবাসা সুপ্ত অবস্থায় লুকানো ছিল। অনুরূপ ভাবে বিভার প্রতি অভীকেরও। একদিন উভয়ের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে সেই ভালোবাসার ধোঁয়া। সেই প্রসঙ্গে লেখক গল্পের কাহিনি বর্ণনার মধ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ করেছেন।

'পেটে পেটে বুদ্ধি' 'মাল্যদান' গল্পে লেখক প্রবাদটি সরাসরি ব্যবহার না করে সেটা ফোকলোর পদ্ধতিতে প্রসঙ্গানুসারে উল্লেখ করেছেন। গল্পে বর্ণিত পিতৃমাতৃহীন পটলের কাছে আশ্রিত মেয়ে কুড়ানি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে তার চিকিৎসার জন্য পটল ভাই যতীনকে ডেকে পাঠালে, যতীন এসে তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী চিকিৎসা করতে থাকে। এই অসুস্থার খবর পেয়ে পটলের স্বামী হরকুমার বার বার কুড়ালির খোঁজ নিতে থাকায় যতীন বুঝতে পারে, দীর্ঘ সময় ধরে হরকুমারের কাছে পটলের অনুপস্থিত থাকার অভাবটি। পটলের কাছে যতীনের এই গভীর মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পটল মন্তব্যটি বিপরীতার্থে বুঝে এভাবে বলেন, — ''পরের দোহাই দিবে বৈকি। ছটফট কে করিতেছেন তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে — তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে।''[২৯] পটল ওখান থেকে চলে গেলেই কুড়ানির সঙ্গে যতীনের গভীর আলাপচারিতার বিশেষ সুবিধা হবে। যতীনের মনে এই ভাবনা থাকায় সে পটলকে হরকুমারের দোহাই দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে সে বেঁচে যায়। যতীনের মনের ভাবকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য পটলের মুখে লেখকের ব্যবহৃত প্রবাদটির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে।

'পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ' প্রবাদবাক্যটির অর্থ মনে মনে ইচ্ছা আছে, কিন্তু বাহিরে অনিচ্ছা প্রকাশ' 'নষ্টনীড়' গল্পে ভূপতির নিকট অমলের বিবাহের প্রস্তাব

এলে, শোনামাত্রই অমলের রাজি হওয়া, ভূপতি ও চারুকে অবাক করে। কারণ এর পূর্বে সে যে বিয়ের সম্মন্ধ এনেছিল তা শোনামাত্র অমল তাতে মত দেয়নি। এটা তার ব্যতিক্রম, তাই এ নিয়ে চারু ঠাট্টা করতে থাকলে অমল নিরুত্তর। এই উত্তরহীনতার জন্য চারু অমলকে বলে, — ''তার চেয়ে বলো না কেন, নিজের ইচ্ছা গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ!''[৩০] চারু অমলের বিয়ের প্রস্তাবে ব্যথিত। কারণ উভয়ে যে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর থাকবে না। তাই নিজের কষ্টকে প্রকাশ করার জন্য উক্ত প্রবাদটি বেছে নিয়ে অমলের উপর যথার্থ প্রয়োগ করেছেন। এই প্রবাদ ব্যবহারে চারুর মনের অবস্থাকেই ব্যাখ্যা করেছেন লেখক।

'বক ধার্মিক' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ যে ব্যক্তি ধার্মিকতার ভান করে। অর্থাৎ যে ভণ্ড। 'উদ্ধার' গল্পে পরেশ সুশ্রী যুবতী স্ত্রী গৌরীর প্রতি সন্দেহবশত একে একে বাড়ির চাকরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে থাকেন। এমনকি গৌরী যার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায় তাকে মুহূর্তের মধ্যে তাড়িয়ে ছাড়েন পরেশ। এ রকম চলতে থাকায় স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। একটা সময় ক্ষতবিক্ষত গৌরী স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে ধর্মে মন দেয়, এবং নবীন ধর্ম প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দের কাছে দীক্ষা নিলে পরেশের মনে আরও সন্দেহ বাড়তে থাকে। একদিন পরেশ পরমানন্দের চরিত্রের আসল রূপ স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করে বলেন, — '' 'দুশ্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, 'তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্বক বলো দেখি সেই বক ধার্মিক কে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।' ''[৩১] পরেশের মৃত্যুর পর অল্প বরস্কা গৌরী স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিল যে সত্যিই পরমানন্দ মধ্যে ধর্ম নয়, ধর্মিকতার ভানে পরিপূর্ণ। লেখক চরিত্রের দুষ্টতা বোঝাতে এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

'বই পোকা' 'শেষ কথা' গল্পে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক অচিরার বক্তব্যে 'গ্রন্থকীট' বাগধারাটির উল্লেখ করেন। এটির মূল রূপ হল 'বই পোকা'। এ প্রসঙ্গে অচিরা অধ্যাপক দাদুকে বলেন, ---- ''সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট করে তুলেছি। এমনি করে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এমনই যেতে হবে যেখানে ফিরে।''[৩২] অচিরা কথনে দাদুর জ্ঞানের সীমা বোঝাতে গল্পকার উক্ত বাগধারা বা বিশিষ্টার্থ শব্দের ব্যবহার করেন।

'বৈতরনী পার' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ পরলোকের যাত্রাপথের শেষ নদী পার হওয়া, কিন্তু কোথাও কোথাও শব্দগুচ্ছটি ব্যবহারিক অর্থ হল স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়া। 'সে' গল্প গ্রন্থে পুপুদিদি কাছে তাঁর দাদামশায়ের আজগুবি গল্প বলার প্রসঙ্গে বলেছেন, — ''তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরনী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।''[৩৩] এখানে 'বৈতরণীপার' শব্দগুচ্ছের মূলার্থটির প্রয়োগ হয়েছে। অন্যদিকে 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে 'রবিবার' গল্পে 'বৈতরণী পার' শব্দগুচ্ছটি দ্বিতীয়ার্থে বা স্বর্গলোক অর্থে বলা হয়েছে। গল্পে অভীক বিভাকে বিয়ের পাত্র সন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর জানায়, আছে 'বৈতরণীর তীরে'। অর্থাৎ বিভা তার উত্তরের ইঙ্গিতের মধ্যেও লেখক শব্দগুচ্ছটির স্বরূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও তেমন' 'নষ্টনীড়' গল্পে অমল মন্দাকিনী বৌঠানের ঘরে গেলে সে তাকে ঠাট্টা করে বলেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসে কাউকে দেখা পেলে? কিন্তু মন্দা জানত যে চারুর অনুপস্থিতির কথা অমলের অগোচর ছিল। এর প্রত্যুত্তরে একটি প্রবাদের উল্লেখ করে অমল বলেছে, — ''বাঁ দিকে বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।''[৩৪] অর্থাৎ মন্দার মন রাখার

জন্য অমল এই বাক্যটির ব্যবহার করে বোঝালেন যে তার কাছে চারুর মতো মন্দারও একই অবস্থা। উক্তির অর্থ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক প্রবাদটি স্থাপন করেছেন। কিন্তু চারুর সঙ্গে মন্দার তুলনা করে অমলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রবাদটি সম্পূর্ণ রূপে ঠিক নয়, যা পাঠক খুব সহজে বুঝতে পারে। এখানে লেখক প্রবাদটি অনুবাদ করে গল্পে ব্যবহার করে চরিত্রের ভাব ধরেছেন।

'মশা মারতে কামান দাগা' প্রবাদটির অর্থ ছোটো কাজের জন্য বিপুল আয়োজন। এটি জনসমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। 'দর্পহরণ' গল্পের কথকের সঙ্গে পাঠ শেষ না হওয়া নির্ঝরিণীর বিবাহ হয়। কিন্তু কথকের পিতা তাদের বিবাহের পর পুনরায় পাঠ গ্রহণের জন্য আলাদা করে দেয়। তাই বিবাহের দাম্পত্য জীবনে প্রণয় লাভের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ পত্রলাভের মধ্যে চলত তাদের প্রণয়লাভ। বাংলা ভাষায় সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ নির্ঝরিণীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে ছিল। ইংরাজি সাহিত্যের উপর কথকের সক্রিয়তা ছিল ভালো। যদিও নির্ঝরিণী ততটা ভালো বুঝত না। তাই তাঁর উপরে বার্ক - মেকলের ছাঁচে চিঠি লিখে পাঠালে নির্ঝরিণীর উপর 'মশা মারতে কামান দাগা'র সামিল হবে। এখানে লেখক নির্ঝরিণীর নিজস্ব ইংরেজি সাহিত্য গ্রহণের অক্ষমতা বোঝাতে প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন।

'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' বাগধারাটির অর্থ অকস্মাৎ বিপদ ঘটা। 'হৈমন্তী' গল্পে মাতৃহীন হৈমন্তী প্রবাসে বাবার আদরে প্রতিপালিত যে সংসারের কোনো কাজ কর্ম ভালোভাবে শেখেনি। তার কর্মহীনতা আত্মীয় পরিজন সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় শাশুড়ি হৈমন্তীকে পূজার ডালা সাজাবার আদেশ দিলে সকলে তাতে স্তম্ভিত হয়। শাশুড়ির এই আদেশ আত্মীয়দের কাছে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। কারণ প্রত্যেকেই হৈমন্তী সম্মন্ধে অজ্ঞ।

এখানে লেখক বাগধারাটির না-বাচকার্থে ব্যবহার করে ঐ অর্থটিকে হ্যাঁ-বাচকার্থে প্রয়োগ করেছেন।

'মাটিতে পা না পড়া' প্রবাদটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যেমন 'কখনো অহংকার, কখনো গর্ববোধ বা আনন্দবোধ, আবার কখনো কোনও কিছুকে পরোয়া না করা।' 'বদনাম' গল্পে সৌদামিনী দ্বিতীয়ার্থে স্বামীর প্রতি ঐ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করে বলেছেন, — ''কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ! আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিস্ট্রিক্ট পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডের নাগাল পেয়েছে নাকি।''[৩৫] লেখক এখানে পাঠক সমক্ষে সৌদামিনীর মনের অবস্থাকে তুলে ধরতে এরকম পরিস্থিতি জ্ঞাপক প্রবাদ ব্যবহারের জন্য নির্বাচন করেছেন।

'মিষ্টান্নমিতরে জনা' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ সাধারণ মানুষ মিষ্টান্ন পেলেই সন্তুষ্ট। 'নামমঞ্জুর গল্প' গল্পে লেখক সরাসরি গল্প কাহিনি বর্ণনার মধ্যে এটির উল্লেখ করেন। এছাড়া 'চোরাই ধন' গল্পেও লেখক প্রবাদটি খণ্ডভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ইতরে জনা'। 'রবিবার' গল্পের নায়ক অভীকের মুখে বিভার যৌবন চেহারার রূপ ও লাবণ্য ব্যাখ্যা করতে করতে লেখক প্রবাদটি এইভাবে ব্যবহার করেন, — 'অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্ন মিতরে জনা'[৩৬] বিভাকে অভীক বলেছে অনাহূত না হলেও ইতরজনও মিষ্টান্ন ভোজ পায়। কিন্তু বিভার রূপ যৌবনের যে সৌন্দর্য তা কেবল আর্টিস্টের, কারণ সাধারণ মানুষজন মিস্টান্নের কদর বুঝলেও সৌন্দর্যের কদর তারা বোঝে না। অর্থাৎ বিভার রূপ সৌন্দর্য কেবল অভীক বোঝে, কারণ অভীক এক জন আর্টিস্টিক। বিভা শুধুই অভীকের। লেখক এখানে অভীকের মনবৃত্তিকে তুলে ধরতে উক্ত প্রবাদের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।

'মুখ চুন হওয়া' 'ল্যাবরেটরি' গল্পে অধ্যাপক রেবতীর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকলে, মোহিনী রেবতীর পক্ষনিয়ে উক্ত বাগধারাটি না-বাচকার্থে ব্যবহার করেন। ব্যবহারিক রূপটি হল, — ''সেই তোমার টাক

পড়া মাথার প্রোফেসর নাম করতে চাই নে দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়।"[৩৭] সে এমন কিছু করবে যা অপরের ভাবনাতীত। জেদের বশবর্তী হয়ে কিছু করা এবং অন্যকে চরম জবাব দেওয়া প্রসঙ্গে লেখক শব্দগুচ্ছটি প্রয়োগ করেন।

'মাকাল ফল' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ যার বহিরাকৃতি অতীব সুন্দর কিন্তু গুণহীন। লেখক 'অপরিচিতা' গল্পে ঠিক তেমনি ছেলেবেলায় অনুপমের নাদুসনুদুস চেহারা থাকলেও, সে পড়াশুনায় একেবারে ভালো ছিল না। তাই পণ্ডিতমশায় তার বহিরাঙ্গের সঙ্গে গুণহীন বস্তু হিসাবে ফলের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রূপ করতেন। গল্পে কথকের ভাবনায়, — "ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমূলফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।"[৩৮]

'শনির দৃষ্টি' মূল শব্দগুচ্ছটির ভাষান্তরিত রূপ হল 'শনির দশা' যার অর্থ হল খারাপ দৃষ্টি বা কুদৃষ্টি। 'রবিবার' গল্পে অভীকের বিয়ের জন্য বিভা পাত্রী দেখার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার উত্তরে সে বলেছিল, — 'কুষ্টির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিল।"[৩৯] অভীকের ইচ্ছা থাকলেও তার কোনও উপায় নেই। কারণ, তার পাশেই তাঁর বিবাহে উপযুক্ত পাত্রী থেকেও সে নীরব। তাই যে অদৃষ্টের উপর চাপিয়ে দেয় সমস্ত দায়ভার। এখানে লেখক উভয়ের কথন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন।

'শুভস্য শীঘ্রম' প্রবাদাঙ্গটির অর্থ শুভ কাজ শীঘ্র সেরে ফেলা উচিত। এটি প্রবাদাঙ্গ হলেও সকলের কাছে প্রবাদ হিসাবে অতি পরিচিত। 'পাত্র-পাত্রী' গল্পে লেখক প্রবাদাঙ্গটি সরাসরি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। সনৎকুমারের বিবাহের জন্য ধনশালী কন্যা দায় গ্রস্ত পিতার সন্ধান পাওয়া

গেল, সর্বদা তাঁর টাকার থলিটাই হাঁ করা ছিল। ঐ অবস্থা দেখে পাত্রের বাবা তাড়াহুড়ো করতে থাকেন। এই দ্রুততা বোঝাতেই পাত্রের পরোক্ষ উক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাদাঙ্গটির উপস্থাপনা। অর্থাৎ সনৎকুমারের বিবাহ যত দেরি হবে, ঐ টাকার থলি থেকে অর্থের আগমন ততটা বিলম্ব হবে। এখানে গল্পকার পাত্রের বাবার চরিত্রকে পাঠক সমক্ষে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন প্রবাদাঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

'সত্যবাদী যুধিষ্ঠীর' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি 'কর্মফল' গল্পে সদাসত্যবাদীর প্রতীক হিসাবে মন্মথকে উদ্দেশ্য করে বিধুমুখী উল্লেখ করেন। মন্মথ নিজের ওজন বুঝে পথ চলতে ভালোবাসে। কিন্তু সে অপরের কৃপায় বেঁচে থাকতে চান না। তাই স্ত্রী বিধুমুখীর প্রশ্রয়ে সতীশ সময়ের সাথে সাথে আভিজাত্য দেখাতে গিয়ে অনেক পরিমানে টাকার দেনায় জড়িয়ে পড়ে। এতে মন্মথ সতীশ ও বিধুমুখীর উপরে খুব রাগান্বিত হয়ে নিজের পূর্বে বলা কর্তব্য থেকে অনড়। আর এই কর্তব্য থেকে বিধুমুখী মন্মথকে সরিয়ে এনে যাতে সতীশের দেনার টাকা সম্পূর্ণ শোধ হয়ে যায়, সেই লক্ষ সাধনে উক্ত শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত। সর্বদা সত্যের আশ্রয়ে সব কিছু পরিপূর্ণ হয় না, এর জন্য মাঝে মাঝে মিথ্যার প্রশ্রয় নিতে হয়, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। ঐ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি প্রয়োগের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ মেটাফোকলোর পদ্ধতির মাধ্যমে মন্মথর মুখে 'আয় বুঝে ব্যায়' প্রবাদটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। উক্ত প্রবাদটি তিনি সরাসরি ব্যবহার করেননি। এভাবে ভাবটি ধরেছেন, — ''যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না — ফকিরেরও না, বাদশারও না।''[৪০] সতীশের সাহেবিয়ানার খরচ জোগানোর ক্ষমতা মন্মথর নেই। তাই সে নিজের ক্ষমতানুসারে ছেলেকে মানুষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ছেলে এবং স্ত্রী তার চিন্তা ভাবনায় কোনও গুরুত্ব দেয়নি।

'সাত রাজার ধন মানিক' শব্দগুচ্ছটির অর্থ মহামূল্যবান বস্তু। 'নষ্টনীড়'

গল্পে লেখক চারুর কথন ভাষ্যে অমলের জন্য দেখা পাত্রীকে সাতরাজার ধন মানিক বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ পাত্রীর কথা শোনা মাত্রই অমলের আর তর সইছেনা। অমলের এই দেরি না হওয়া প্রসঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পকার শব্দগুচ্ছের যথার্থ ব্যবহার করেছেন। এখানে শব্দগুচ্ছটি চারুর ভাবনায় যথার্থ গুরুত্ব পেয়েছে।

'গল্প' নামক গল্পে লেখকের ভাষায় মানুষ হল গল্পপোষ্য জীব। এরা সকল সময় কল্পনার জগতে অবস্থান করে। একটু কোনও সত্য ঘটনার আভাস পেলে সেটা একটা গল্পে পরিণত হয়। তাই শুধুই আকবর বা অশোকের গল্প সত্য নয়, কল্পনা লোকে অবস্থিত 'সাতরাজার-ধন মাণিক' এর সন্ধানে রাজপুত্রের নিরুদ্দেশের যাত্রা, সেটা ও চরম সত্য বলে ধরে এই মনুষ্য সমাজ।

'রাসমণির ছেলে' গল্পে পূর্বে উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছটি অন্য প্রসঙ্গে প্রয়োগ হয়েছে। লেখকের বর্ণনায় কালিপদ গ্রামের ছেলে, মা বাবার অতিআদরের, মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য সে অজানা শহর কলকাতায় এসেছে পড়াশুনা করত। ঔ শহরের এক অস্বাস্থ্যকর ঘর তার ঠিকানা। যেখানে সে নিজের অদম্য ইচ্ছা পূরণ করার কাজে ব্যস্ত। তাই দীন দরিদ্র কালিপদ বড়োলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দ্বিধাবোধ করে। অনেক দিন কলকাতায় কাটানোর পর সে গ্রামে গিয়েছে, সেখান থেকে ফেরার সময় মা রাসমণি কালিপদর পছন্দের মুখরোচক চালতা, আম ও কুলের আঁচার একটি পুঁটলিতে বেঁধে দেয়, যা কালিপদ কলকাতার ঘরের মধ্যে অতিযত্নে খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে রেখেছে। পূর্বে এই ঘরে কোনও দিন তালার ব্যবস্থা ছিল না। মায়ের দেওয়া জিনিস সে তালা-চাবি দিয়ে রেখেছে। কালিপদর এই অস্বাভাবিক আচরণ দেখে পাশের ঘরে থাকা বন্ধুদের দলপতি শৈলেন বললো, ''এবার কালিপদ কোন সাতরাজার-ধন মাণিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা

খুঁজিয়া বাহির করো।”[৪১] এখানে ব্যক্তি, বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রে শব্দগুচ্ছটি লেখক প্রয়োগ করেন।

‘সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর’ ‘গল্পসল্প’ গল্পগ্রন্থে ‘ম্যাজিসিয়ান’ গল্পে ভারতচন্দ্রের সৃষ্ট উক্ত প্রবাদটি রবীন্দ্রনাথ কোনও রকম পরিবর্তন না করে অখণ্ডাবস্থায় ব্যবহার করেন। প্রবাদের ব্যবহারিক রূপটি এরূপ, — ‘‘জীবনে অনেক দুষ্কর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন — সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।”[৪২] গল্পে দাদামশায়কে কুসুমি তাঁর জীবনের কর্তৃত্ব, অর্থাৎ তাঁর লেখা বড় বড় বই, তাঁর বলা অনেক কথার জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে দাদামশায় নামক চরিত্রের মুখে লেখক প্রবাদটি সংস্থাপন করেন। তাঁর কর্মগুলো সে দুষ্কর্মের স্বীকারের প্রয়াশ তা প্রবাদের প্রয়োগ কৌশলে পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

‘হ-য-ব-র-ল’ বাগধারাটির অর্থ হল জট পাকানো বা খিচুড়ি পাকানো। ‘শেষ কথা’ গল্প শুরুতেই লেখক উক্ত বাগধারা ব্যবহার করে বলেছেন, — ‘‘জীবনের প্রবাহ মান খোলা রঙে হ-য-ব-র-ল-র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধরে সদ্য দেখা দেয়।”[৪৩] গল্পে জটিলতা তৈরি হওয়ার অনেক আগেই যেমন নায়ক-নায়িকার পরিচিতি ঘটে, ঠিক তেমনি অনুসরণ করতে হয় ঐ জটিলতার ইতিহাস। আর এই খিচুড়ি পাকানোর মধ্য থেকে জেগে ওঠে নতুন সৃষ্টি। গল্পে জট-পাকানো প্রসঙ্গে বাগধারাটির প্রয়োগ এখানে যথার্থ।

‘হাতের পাঁচ’ বাগধারাটির অর্থ শেষ সম্বল। ‘সদর ও অন্দর’ গল্প রবীন্দ্রনাথ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহারে নতুন কৌশল প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ মূল শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার না তিনি শব্দগুচ্ছটির অর্থ প্রয়োগ করেছেন। বিপিন কিশোর ধনীগৃহে জন্মালেও সে গানবাজনা ও কাজকর্মে একে বারে সিদ্ধ হস্ত। রাজা চিত্তরঞ্জনের কাছে বহুমুখী প্রশংসার পাত্র। তবে তাঁর সদরে অন্দরে হলেও কিন্তু অন্দরমহল তাঁর প্রতি বিমুখ। বিপিনের প্রতি সদর মহল থেকে

বিমুখতার ভাব সৃষ্টি করার জন্য অন্দরমহল থেকে বিমুখতার পরিবর্তে রাজার চেয়েও বেশি বিপিনের প্রতি আদর বেড়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি ক্রমশ রাজার সম্মুখে ঘটতে থাকলে রাজা রাগান্বিত হয়ে বিপিন গৃহচ্যুত করে। এই গৃহচ্যুত হওয়ার কারণ বিপিন ঘুণাক্ষরে না জানায় রাজার প্রতি অভিযান করে গৃহত্যাগ করে। এই সময় বিপিনের কর্মজীবনের সঞ্চয় মাত্র দুই টাকা রাজভৃত্য পুঁটেকে পুরস্কার দিয়ে যায়। এই দুই টাকা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা বিপিনের কাছে।

'হাল ছেড়ে দেওয়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হতাশ হয়ে সব চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া। 'নষ্টনীড়' গল্পে অমল ভূপতি ও বউঠান চারুবালাকে ছেড়ে বিলেতে চলে যায়। বন্ধুসম অমলের চলে যাওয়াতে চারু কোনও কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। তার সমস্ত স্মৃতি জুড়ে অমলের জায়গা। অপর দিকে ভূপতি এই স্মৃতির মায়া থেকে চারুকে রক্ষা না করে নিজের অজান্তে চারুকে আঘাত দিতে থাকে। অবশেষে চারু সহ্য করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষান্ত হয়েছে। সে আর অমলকে নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে নিজের কাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রসঙ্গে শব্দগুচ্ছটির ব্যবহার হয়েছে।

'হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি' শব্দগুচ্ছটি পরিপূর্ণভাবেই দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রচলিত। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে মধু কৈবর্ত্যের চাতুর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জমিদারের পুত্রবধূ কিরণের মুখে এটি উপস্থাপন করেছেন। কারণ জমিদারের কাছে মধুর বকেয়া দেনা শোধ করার জন্য জমিদার এবং নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হলেও তার কোনো সুরাহা হয়নি। তাই সে স্ত্রী সুখদাকে কিরণের কছে পাঠালে, সুখদা দেনার দায় মুক্ত হওয়ার জন্য প্রবলভাবে কান্নাকাটি করতে থাকে। সুখদার কাছে কিরণের অক্ষমতা প্রকাশ পেলেও স্বামী বনোয়ারী নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে গিয়ে মধুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এর ফল-স্বরূপ জমিদারের পুত্র হিসাবে বনোয়ারী যতটা ক্ষমতা অধিকারী তা থেকে

সে বঞ্চিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয় স্ত্রী কিরণবালা। তার ধারণা মধুর এই চাতুর্যের জন্য বনোয়ারীর এ দশা। বনোয়ারীকে ঠকানোর জন্য কিরণ ব্যথিত ও দুঃখিত। তাই সে মধুকে দেখতে পারে না। মধুর ভিতরে ভিতরে দুষ্টবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ তা কিরণের বর্ণনায় প্রবাদ প্রয়োগে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

'হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে' 'লিপিকা' গল্প গ্রন্থের দ্বিতীয় সংখ্যক গল্পে রূপকথার রাজ্যের রাজকন্যার রূপ ও গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রবাদটির আংশিক ব্যবহার করেছেন লেখক। ব্যবহারিক রূপটি এরূপ, — ''চাঁপা ফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।''[৪৪] রূপকথার রাজকন্যা নয়, গল্পে এক মা-বাবা মরা ভাগ্য বিড়ম্বিতা মেয়েটির কথা বলা হয়েছে। 'রাজপুত্তুর' গল্পে না-বাচকার্থে প্রবাদাঙ্গটির প্রয়োগ হয়েছে। আবার 'সে' গল্প গ্রন্থে প্রথম গল্পে প্রবাদটি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু প্রবাদটির অর্থ সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার হয়েছে। 'সে' গল্পে যে মেয়ে রূপকথার জগতের মোহময়ী সুন্দরী কন্যা। রাজকন্যার সৌন্দর্য বর্ণনা এরূপ, — ''যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মাণিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না।''[৪৫] সুতরাং রূপকথার কল্পনার জগতে কল্পিত অবাস্তব নারীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রবাদটির ব্যবহার।

'হালে পানি পায় না' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ কোনও কাজের জন্য উপযোগী অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি না পাওয়া। 'লিপিকা' গল্প গ্রন্থের 'গল্প' নামক গল্পে রূপকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দিদিমার কাছে গল্প শোনা একটি শিশুর কথা, সে মনে মনে রূপকথার কল্পনা সাগরে তরী ভাসায় এবং বাস্তব সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে টেনে আনে বাস্তব পরিবেশের ধারাপাতের মধ্যে। এই প্রসঙ্গক্রমে লেখক বলেছেন,— ''শিশুটি

তখন যে রাজ্যের অধিবাসী 'সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।"[৪৬] কল্পনা ছাড়া ধারাপাত দিয়ে ঐ জগৎ জয় করা সম্ভব নয়। না-বাচকার্থে প্রবাদটির ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

'হাড় কালি হওয়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল কঠোর পরিশ্রম হওয়া। 'সে' গল্পগ্রন্থের 'গেছোবাবা' গল্পে মূল শব্দগুচ্ছটি ভাষান্তরিত হয়ে 'হাড় মাটি হওয়া' রূপে একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন লেখক। গল্পে উধোর কাছে গোবরা গেছোবাবার অসাধারণ শক্তির সন্ধান পেয়ে, সে মাসখানেক ধরে খুঁজতে থাকে। কিন্তু গেছোবাবার কোনও টিকিও সে পায় নি। উধো গোবরার কাছে গেছোবাবার সন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা করলে, সে বলেন, — ''আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।"[৪৭] সুতরাং এখানে এই উক্তির মধ্যে দিয়ে গল্পকার চরিত্রের মনোভাব এবং গল্প কথনের সরসতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই শব্দগুচ্ছটি লেখক সঠিক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'হাঁউ মাঁউ খাঁউ' 'লিপিকা' গল্প গ্রন্থের 'গল্প' নামক গল্পের রূপকথার রাজ্যে রাক্ষস-রাক্ষসীদের যে চিৎকার তা শিশুমনে স্মৃতিস্বরূপ অবস্থান করে। ঠাকুমা বা দিদিমার কাছে গল্প শোনে তখন সে শিশু বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে রূপকথার রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। গুরুমশায় তখন তাকে যতই নামতা বা তিন চারে বারো হয় বলুক না কেন, তা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। সে সব কিছুতেই ছাড়িয়ে কল্পরাজ্যে পাড়ি দিতে থাকে। তেমনটি ঘটেছে 'গল্প' নামক গল্পে। এই বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছটি ব্যবহারের পিছনে হয়ত লেখকের শৈশব স্মৃতি অনেকাংশে দায়ি। কারণ তিনিও সেই ছোট্টোবেলায় দিদিমার কোলের কাছে শুয়ে রূপকথার গল্পে শুনে কল্পনার তীরে তরী ভাসিয়ে ছিলেন। শৈশবে মা, ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরের পুত্রের গল্প শুনতে শুনতে সব কিছুর মধ্যে তারা এগুলি দেখতে পায়। তবে লেখক

শব্দগুচ্ছটিকে শিশুকল্পনার বিস্তারকে জানাতে যথার্থ অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার একই প্রসঙ্গানুসারে 'রাজপুত্তুর' গল্পে শব্দগুচ্ছটি পরিপূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, 'রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা - প্রাক-কথন

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (নবম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৫৭০

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৭২২

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩৩

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৮

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৪১

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫৮

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩০

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৭২১

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৫

১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪৮

১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫৬

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫৬

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫৬

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৭

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৫০০

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩৩

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০

২০। তদেব, পৃষ্ঠা ৪১২

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩০

২২। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০২

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৪

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৭

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৫০৯

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৩

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৪৩

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩৯

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮০

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫৮

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২০-৩২১

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭৯

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯৪

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৭

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮২

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩৪

৩৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭৪

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৮

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৪৩

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯৩

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৪৯

৪২। তদেব, পৃষ্ঠা ৮২৮

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৪৬

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩১

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭৬

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৬২৩

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮৩